মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস

[দ্বিতীয় খণ্ড]

অনিরুদ্ধ রায়
প্রাক্তন অধ্যাপক
ইসলামি ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিবেশক
মিত্রম্
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭৩

প্রগতিশীল প্রকাশক
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট ঃঃ কলকাতা-৭৩

Scanned with CamScanner

পরিচ্ছেদ উনচল্লিশ

সংস্কৃতি ঃ চিত্রকলা, স্থাপত্য, ধর্ম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

দরবারী চিত্রকলা

দিল্লির সুলতানদের দরবার থেকে কোন অণুচিত্র বা পুঁথিপত্র পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমীর খসরু ও সমকালীন লেখকরা দেয়াল-চিত্রণ ও চিত্রকরদের উল্লেখ করেছেন। ভারতে মুঘলরা আসার আগেই পুঁথিপত্র শুরু হয়ে যায়। পূর্বভারতে পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ পুঁথিচিত্রণ চলতে থাকে। জৈন পুঁথিচিত্রণ পদ্ধতি, যাকে পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্রণ বলে বলা হয়েছে, সেগুলিও চলে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুলতানী যুগ প্রতিষ্ঠিত হলে পারসীক চিত্রকলার প্রভাব জৈন পুঁথিচিত্রণের উপরে পড়তে থাকে। এইগুলিতে পারসীক রঙের ব্যবহার বিশেষ করে নীল রং এবং *শাহী* নামে পরিচিত বিদেশী রাজার মূর্তি স্থান পেতে থাকে। ক্রমশ পারসীক চিত্রকলার রেখা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, চিত্রভূমির বিভাজন ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়।

প্রয়োগরীতি লক্ষ্য করে শিল্প-ঐতিহাসিকরা দুটি রীতি ধরেছেন—একটি ক্লাসিকাল ও অন্যটি মধ্যযুগীয়। প্রথমটিতে শিল্পীরা ভাস্কর্যের বিন্যাস অনুযায়ী কাজ করেছেন। দ্বিতীয়টিতে রয়েছে তীক্ষ্ণকোণযুক্ত রেখাবহুল ভাগ, যেটি বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে দেখা যায়। পালযুগের চিত্রকলায় অনেক সময়েই এই দুই রীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত অধিকাংশ পুঁথি ছিল তালপাতার, যাদের অধিকাংশ ছিল আখ্যানধর্মী। দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাই ছিল প্রধান। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে সামাজিক বিবর্তনের প্রভাব চিত্রকলার উপরেও পড়ে। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৌদ্ধ শ্রমণরা তিব্বতে ও নেপালে চলে গেলেও, বণিক ও রাজন্যবর্গের দাক্ষিণ্যে পশ্চিমভারতে পুঁথিচিত্রণের কাজ চলতে থাকে। পরের দিকের এই ধরনের চিত্রকলায় পারসীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জৈন মন্দিরগুলির সঙ্গে লাগানো *জ্ঞানভাণ্ডারে* জৈনরা এইসব পুঁথিগুলি দিতেন এবং ঐ ধরনের বহু পুঁথি রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও গুজরাটের *জ্ঞানভাণ্ডার*গুলি থেকে পাওয়া গিয়েছে। এগুলি আমাদের পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতকের পুঁথিচিত্রণের বিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই তালপাতার বদলে কাগজের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। এর ফলে চিত্রকরেরা আরো বেশি রং করার সুযোগ ও বাড়তি চিত্রভূমি পেয়ে যায়। এর ফলে পুঁথিচিত্রণে বেশি রং-এর ব্যবহার ও অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথমদিকে এই পরিবর্তনগুলি ধীরে ধীরে এলেও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষদিকের কাজে এগুলি স্পষ্ট হয়ে আসে।

Scanned with CamScanner

মাণ্ডুতে জৈন পুঁথিচিত্রণ পাওয়া গেলেও সুলতানী যুগে সম্ভবত গিয়াসউদ্দিন খলজীর সময়ে করা *নিয়ামতনামা* উল্লেখযোগ্য, যার মধ্যে গিয়াসউদ্দিনের বাবা সুলতান নাসিরুদ্দিন খলজীর প্রতিকৃতি আছে। ১৫০২ সালে করা মাণ্ডুর আর একটি পুঁথিচিত্রণ (*রাজ্ঞান* পুঁথি) পাওয়া গিয়েছে যার সঙ্গে পারসীক চিত্রকলার আঙ্গিকের সাদৃশ্য রয়েছে।

জৌনপুরও শিল্পকলায় বিখ্যাত জায়গা হয়ে উঠেছিল সুলতানী যুগে, যেখানে কবি কুতবন পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের সুলতান হোসেন শাহ শর্কীর সময়ে *মৃগাবৎ* লিখেছিলেন। এখানে করা হয় বিখ্যাত *হামজানামা, সিকান্দার-নামা-ই বাহরী* ও *খামসা-ই আমীর খসরু*। আহমেদাবাদও এই সময়ে শিল্পকলার জায়গা বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। এর মধ্যে বহু জৈন পুঁথি পাওয়া গিয়েছে কিন্তু বিখ্যাত *আনওয়ার-ই সহেলী* ছাড়া আর কোন ইসলামীয় পুঁথিচিত্রণ পাওয়া যায়নি।

এই জৈন এবং ইসলামীয় চিত্রপদ্ধতি একটা নূতন ধরনের চিত্রকলার আঙ্গিকের জন্ম দেয়, যেটি পরবর্তী কয়েকটি দশক ধরে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এই ধরনের আঙ্গিকের চিত্রকলাগুলিকে *লৌর-চন্দ্রাণী-চৌর-পঞ্চাশিকা* গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। এগুলির মধ্যে অন্যান্য পুঁথির খণ্ডিত অংশ রয়েছে, যেগুলিকে মহাভারতের *আরণ্যক পর্বের* অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়েছে। বলাবাহুল্য যে এগুলি মধ্যে *লৌর-চন্দ্রাণীর* মত উচ্চমানের সবগুলি নয়।

মুঘল যুগের প্রথমদিকে ১৫১০ সাল নাগাদ দিল্লির কাছে *মহাপুরাণ* নামে পুঁথিচিত্র করা হয়েছিল। এর আঙ্গিক ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকের জৈন পরম্পরার মত। একই সঙ্গে দেখা যায় যে ১৫১৬ সালে করা *আরণ্যক* পরম্পরার নিদর্শন-এর মধ্যে রয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই গোষ্ঠীর অন্য চিত্রণের তারিখ নির্ণয় করা শক্ত। কারণ আকবরের সময়কার পাঁচ-কোণ বিশিষ্ট ধরন এতে নেই (*চাকদার জামা*)। এর ফলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করছেন যে *লৌর-চন্দ্রাণী* গোষ্ঠীর চিত্রণের মধ্যে পাঁচ-কোণ বিশিষ্ট জামা থাকার ফলে এগুলি আকবরের প্রথমদিকের করা। কিন্তু যেহেতু এগুলি ১৫১৬ সালের *আরণ্যকের* সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে, সেহেতু এই মত মেনে নেওয়া শক্ত। সম্ভবত এগুলি দিল্লি থেকে জয়পুরের মধ্যেকার জায়গায় করা হয়েছিল।

সুলতানী চিত্রকলার বড় নিদর্শন হল গৌড়ের সুলতান নসরৎ শাহের জন্য ১৫৩১-৩২ সালে পুঁথিচিত্র *সফরনামা*, যেখানে লিপিকার ও সুলতানদের নাম আছে। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে কেউ কেউ ব্যতিক্রম বলে ধরেছেন। এগুলি রয়েছে মানুষের শারীরিক আদলে, স্থাপত্যের চিত্রণে ও দৃশ্যগ্রাহ্য জগতের চিত্রণের মধ্যে। লাল ইঁট দেওয়া ত্রিকোণ ছাদের ব্যবহারে জীবজন্তুর আঞ্চলিক লক্ষণ ফুটে উঠেছে। পারসীক চিত্রকলার এটা প্রাদেশিক রূপ এতে পাওয়া যায়।

১৫৫০ সালের পর থেকে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডায় মুঘল সাংস্কৃতিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-মুঘল আমলের পারসীক প্রভাব আঞ্চলিক শিল্পধারার সঙ্গে মিশে যে নূতন আঙ্গিক সৃষ্টি করেছিল, তারই একটা ধারা দাক্ষিণাত্যে গড়ে ওঠে। মনে হয় যে দরবারী আনুকূল্য ও অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় এটি গড়ে উঠেছিল।

Scanned with CamScanner

এইসব অণুচিত্র ও পুঁথিচিত্রণ সাধারণত লাল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নীল, সবুজ বা হলুদ পশ্চাদভূমির উপরে করা হয়েছিল। সহজ সরলভাবে আঁকা মহিলাদের সরু কোমর, উন্নত বক্ষ, চোখা নাক, বড় বড় চোখ এবং চৌকো মুখ যার পিছনে থাকত নৈসর্গিক দৃশ্য। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকের ছবিগুলির মধ্যে একটা উদ্দাম উচ্ছলতা দেখতে পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ সময়েই মূল কাহিনী পরম্পরার উপর নির্ভরশীল নয়। নানান জনপ্রিয় কাহিনী প্রধানত ধর্মের, শিল্পীর কাছে নূতন ধারণা এনে দিয়েছিল। এই চিত্রগুলি পরবর্তীকালে রাজস্থানী আঙ্গিকের রূপান্তরকে সাহায্য করেছে। এক যুগ থেকে অন্য যুগে নিয়ে যাবার কাজে এদের গুরুত্ব অসীম।

আদি মুঘল চিত্রকলা

মুঘল যুগের চিত্রকলার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হুমায়ুন। দিল্লির সিংহাসন হারিয়ে তিনি যখন পারস্য ও আফগানিস্তানে আশ্রয় নেন তখনই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন পারস্যের দুজন বিখ্যাত চিত্রকর মীর সৈয়দ আলি এবং আবদুস সামাদ। ওঁরা মুঘল সাম্রাজ্যের অস্থায়ী রাজধানী কাবুলে কাজ শুরু করেন। এইখানে অল্পবয়স্ক আকবর চিত্রকলার পাঠ নেন। এই সময়ে করা আবদুস সামাদের কয়েকটি ছবি জাহাঙ্গীর সংগ্রহ করে গুলশান অ্যালবামে রেখেছিলেন।

হুমায়ুন দিল্লিতে ফিরে এলে ঐ দুই ওস্তাদই ওঁর সঙ্গে আসেন। ওখানে একটা বড় কারখানা তৈরি করা হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে উৎকৃষ্টমানের শিল্পীদের এখানে নিয়ে আসা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে এখান থেকে বিখ্যাত কয়েকটা পুঁথিচিত্রণ বেরিয়ে আসে। এগুলির মধ্যে *হামজানামা* বিখ্যাত। একটা বড় আকারের পুঁথিতে নানান রং দিয়ে করা ১২০০ ছবি ছিল, যার মধ্যে মাত্র কয়েকটি পাওয়া গিয়েছে। নবীর কাকা আমীর হামজার আধা-পৌরাণিক কার্যকলাপের কাহিনীতে আকবর আনন্দ পেতেন এবং এটি জেনানা মহলে রেখেছিলেন। আবুল ফজল, বদাওনী, শাহনওয়াজ খান ইত্যাদি লেখকরা এটির উল্লেখ করেছেন। যদিও এঁরা বলছেন যে আকবর পনেরো বছর ধরে মীর সৈয়দ আলি ও পরে আবদুস সামাদের তত্ত্বাবধানে এটি করিয়েছিলেন। অন্য একজন সমকালীন লেখক, মুল্লা আলাউদদৌলা কাজভিনী বলছেন যে এটি হুমায়ুনের উৎসাহে করা হয়েছিল। কিন্তু এর আঙ্গিক থেকে মনে হয় না যে এটি ভারতের বাইরে করা হয়েছিল বিশেষত এমন একটা সময়ে যখন হুমায়ুনের অবস্থা ভালো নয়। সম্ভবত এটি সমাপ্ত হয় ১৫৭৫-৭৬ সালে। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রাসাদ ও দুর্গের অভ্যন্তর, আনুষঙ্গিক লোকজন, সৈন্য, মহিলা পার্শ্বচর নানান রং-এ করা হয়েছে বলে দেখতে উজ্জ্বল লাগে।

আরো কয়েকটি অণুচিত্র পাওয়া যায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *আশিকা* পুঁথি (১৫৬৮ সাল), *আনওয়ার-ই সহেলী* (১৫৭০ সাল), *তিলাসম* (তারিখ নেই) ইত্যাদি। *আনওয়ার*-এর চিত্রগুলি ভারতীয় পরম্পরার থেকে পারসীক পরম্পরার কাছাকাছি।

Scanned with CamScanner

এখানে বলা দরকার যে আকবরের রাজসভায় স্বকীয় একটা শিল্পশৈলী গড়ে উঠেছিল। প্রথমদিকের কাজে পারসীক রূপকথার জগৎ প্রভাব বিস্তার করেছিল। পারসীক চিত্রকলার পরম্পরার থেকে ক্রমশ ভারতীয় বাস্তবতা ঐসব অণুচিত্রণে এসে যায়। প্রাক-মুঘল চিত্রপদ্ধতিতে দক্ষ শিল্পীরা মুঘল কারখানায় কাজ পেতে থাকেন। তাঁরা পারসীক আঙ্গিক গ্রহণ করলেও পুরানো শিক্ষাপদ্ধতি বিসর্জন দেননি। ফলে একটা নূতন শৈলীর জন্ম হল যাকে প্রাদেশিক চিত্রশৈলী বলা যায় না। ভারতীয় বাস্তবতার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় একটি ছবিতে। এখানে আকবর রাজসভায় বসে আছেন। দরবারের স্থাপত্য ছাড়াও সভাসদদের পোশাকগুলি দেখলে বোঝা যায় যে শিল্পী তাঁর নিজের চোখে দেখার উপর নির্ভর করে ছবিটি এঁকেছেন।

এটা এখন পরিষ্কার যে আকবর মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করেন নি, কিন্তু তিনি অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে বিশদ জানতে চাইতেন। উনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের পারসীক ভাষায় অনুবাদ করান যাতে তাঁর পরিবার ও অন্যান্য অভিজাতরা ঐসব গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিশদ জানতে পারেন। বদাওনীর রচনা থেকে জানা যায় যে এর ফলে গোঁড়া মুসলমান সমাজে একটা নাড়া পড়েছিল। এই অনুবাদগুলির সঙ্গে চিত্রও করা হয়েছিল। আবুল ফজল বিভিন্ন বিষয়ে রচিত বইগুলির তালিকা দিয়েছেন। এগুলির চিত্রায়ণের ভার দুজন পারসীক ওস্তাদের হাতে থাকলেও, বহু ভারতীয় চিত্রকর ওদের অধীনে কাজ করেছিলেন। কালক্রমে এঁদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। আবুল ফজল যেসব ভারতীয় চিত্রকরদের নাম করেছেন তাদের অনেকেই ছিল হিন্দু। এদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় দাসওয়ান্ত, বাসাওয়ান, কেশব, লাল, মুকুন্দমধু, জগন, মহেশ, খেমকরণ ইত্যাদি যাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশ, মালব, গোয়ালিয়র, গুজরাট, লাহোর, কাশ্মীর ইত্যাদি জায়গা থেকে। আবুল ফজল বলছেন যে এক কাহারের ছেলে দাসওয়ান্তের চিত্রকলায় আকবর মুগ্ধ হয়েছিলেন।

একমাত্র *রজমনামা* পুঁথিতেই দাসওয়ান্তের আঁকা চিত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু এটি উনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি, কারণ ১৫৮৪ সালে উনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই পুঁথিচিত্রণটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন আবদুস সামাদের ছেলে মুহম্মদ শরীফ। দাসওয়ান্ত কতকগুলি রেখাচিত্র মাত্র করে গিয়েছিলেন, যেগুলি সম্পূর্ণ করেন আর একজন চিত্রকর। বলা হয় যে এটিতে অনেক চিত্রকরই হাত লাগিয়েছেন।

রাজকীয় কারখানাতে আরো অনেকগুলি পুঁথিচিত্রণ করা হয়েছিল যেগুলির উপর *রজমনামার* প্রভাব পড়েছিল বলে ধরা যায়। *রজমনামায়* মুঘল চিত্রকলার একটি নূতন বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। পারসীক চিত্রকলার উজ্জ্বল রং-এর সঙ্গে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের শ্যামবর্ণ পীত বসন। কাহিনীটি হিন্দুদের কাছে জনপ্রিয় করার জন্য রাজপুত রাজাদের পোশাক ও মুকুট হিন্দু দেবদেবীদের মত সজ্জিত করা হয়। এই আঙ্গিকের বিস্তার পরবর্তীকালের *রামায়ণ, যোগবশিষ্ট* ও *হরিবংশে* দেখা যায়।

রামায়ণ পুঁথিচিত্রণটি সমাপ্ত হয় রাজকীয় চিত্রশালায় নভেম্বর ১৫৮৮ সালে। আবুল ফজলের উল্লিখিত প্রায় সবাই (পাঁচজন বাদে) এই কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর

Scanned with CamScanner

মধ্যে ১৭৬টি চিত্র রয়েছে। প্রায় একই সময়ে করা *যোগবশিষ্ট* ও *হরিবংশে* পারসীক চিত্রশৈলীর অনুকরণ দেখা যায়। কিন্তু এই আঙ্গিকে বাস্তব জগৎ প্রায় নেই—দূরত্বের কোন আভাষ নেই এবং চিত্রভূমির ভাগ হয় সমান সমান। চিত্রকলায় আলঙ্কারিক কাজ প্রাধান্য পায়। কিন্তু এখানে আকবরের রাজসভাকে ইন্দ্রের রাজসভার সঙ্গে তুলনীয় করে হিন্দুদের কাছে এই শাসনক্ষমতাকে নিয়ে আসার চেষ্টা দেখা যায়। ফলে রাজপুত সভাসদদের কাছে আনুগত্যের সমস্যা তীব্র হয়ে ওঠে না।

মেবার যুদ্ধকে আকবর *জেহাদ* বা ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে গোঁড়া মুসলমানদের খুশী করলেন। তাঁর *জিজিয়া* কর বা তীর্থকর বাতিল করা এবং *দীন-ই ইলাহীর* ও *সুল-হি কুলের* মধ্য দিয়ে অমুসলমান প্রজাদের আনুগত্য পেতে চেষ্টা করেছিলেন, যেটাকে অনেকেই বলেছেন শাসনব্যবস্থার ভারতীয়করণ পদ্ধতি। এটির জন্য আকবর তাঁর বংশ মর্যাদার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। মুঘলরা যে তৈমুরের বংশধর এটা প্রমাণ করার জন্য আকবর থেকে শুরু করে সব মুঘল সম্রাটই চেষ্টা করেছেন। এই জন্য ঐ সময়ে *তারিখ-ই খানদার-ই তিমুরিয়া* লেখা হয় যার সঙ্গে চিত্র যোগ দেওয়া হয়। আকবরের রাজত্বকালের অধিকাংশ শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে রয়েছে তৈমুরের বাল্যকালের ঘটনার বর্ণনা ও তৈমুরের যুদ্ধের বর্ণনা, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তৈমুরের বাগদাদ অভিযানের ঘটনাবলী। এর মধ্যে আকবর দেখাতে চেয়েছিলেন মুঘল পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী যেটি তাঁর শাসন ক্ষমতাকে বৈধতা এনে দেবে। পিতা থেকে পুত্রের ক্ষমতালাভের যে চিরাচরিত প্রথা সেটিকে তুলে ধরা হয়েছে বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের নানান ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে। *বাবরনামা* ও *আকবরনামাতেও* ঐ একই প্রচেষ্টা দেখা যায়। চিত্রশৈলীর গতি কিভাবে সমসাময়িক মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছে, আবুল ফজলের *আকবরনামা* তার বড় উদাহরণ।

আবুল ফজল ১৬০২ সাল পর্যন্ত লিখে মারা গেলে *আকবরনামা* অসম্পূর্ণ থাকে। ১৫৯০ সাল থেকে আকবরের আদেশে এর চিত্রণ শুরু হয়, যার মধ্যে একটা নূতন আঙ্গিকের শুরু লক্ষ্য করা যায়। একই সঙ্গে বাস্তব ঘটনার চিত্রণ ও সভ্যতার ইতিহাসের ঘটনাবলীকে দেখানোর চেষ্টা হতে থাকে। এখানে আকবরকে শুধু জমকালো পোশাক পরা এক ধরনের রাজা বলে বোধ হয় না। তাঁর মুখের চেহারার স্পষ্ট আদল এসে যায়, যেটা প্রাক্-মুঘল যুগের রাজাদের প্রতিকৃতিতে পাওয়া যায় না। ১৫৮০ সালের পরবর্তী সময়ে নূতন ধরনের প্রতিকৃতি দরবারে শুরু হয়ে যায়। *আকবরনামার* পরের দিকের কিছু অংশ জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের সময়ে চিত্রিত হয়েছিল। পারসীক রীতি অনুযায়ী আখ্যানমূলক চিত্রণ করা হলেও মুঘল শিল্পীরা আকবরের জীবনের ঘটনাবলীর কয়েকটা নাটকীয় মুহূর্তের উপরে জোর দিয়েছেন। দরবারের মধ্যে আতকা খানকে হত্যা ও আধম খানের মৃত্যুর অনন্য ছবি এঁকেছেন মিশকিন। আকবরের আদেশে আধম খানকে দোতলা থেকে ফেলে দেওয়া হল। তার ভয়াবহ দৃশ্য ও সম্রাটের মহিমা পরিষ্কার হয়ে যায়।

Scanned with CamScanner

এই সময়ে *বাবরনামার* চিত্রণ করা হয়, যেগুলির মধ্যে নানা ধরনের অসংগতি রয়েছে। *বাবরনামার* চিত্রগুলি অনেক বেশি পুঁথিনির্ভর এবং ক্রমাগত পিছনের ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত যা *আকবরনামায়* নেই। *বাবরনামার* চিত্রগুলিতে অনেক বেশি ভাবালুতা। *আকবরনামায়* রয়েছে অনেক বেশি ভয় ও সম্ভ্রম।

রীতিগত দিক থেকে দেখলে মুঘল শিল্পীরা ক্রমশ পারসীক ও প্রাক-মুঘল চিত্রণ পদ্ধতি থেকে সরে আসছিলেন। তাঁরা যথাযথ দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্ররীতির দিকে ঝুঁকছিলেন প্রধানত ইউরোপীয় চিত্রকলা থেকে। কিন্তু পারসীক রীতি সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেননি। এর উজ্জ্বল রং-এর সমাবেশ, গাঢ় ও হালকা রং-কে পাশাপাশি রেখে নাটকীয় মুহূর্ত ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার চেষ্টা তাঁরা ছাড়েন নি। পরিপ্রেক্ষিত রচনার জন্য তাঁরা এক মিশ্র রীতি আনার চেষ্টা করেছিলেন। সামনের বস্তুর আয়তন ও গুরুত্ব বাড়িয়ে এবং দূরবস্তুর আয়তন কমিয়ে আনার যে ধারা ইউরোপীয় চিত্রশৈলীতে পাওয়া যাচ্ছিল, মুঘল চিত্রশিল্পীরা তাঁর কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একই দৃশ্যকে বিভিন্নভাবে দেখার ধারা মুঘল শিল্পীরা পারসীক রীতি থেকে গ্রহণ করেছিলেন। বাকী অংশটি তাঁরা লোকশিল্প থেকে গ্রহণ করেন। সমসাময়িক রাজস্থানী চিত্রকলা, পুরাণ, লোকগাথাগুলিকে এঁরা সমান মর্যাদা দিতে থাকেন।

এসবের ফলে দেখা যাচ্ছে যে মুঘল শিল্পীরা রূপকথার জগৎ থেকে পার্থিব জীবনের ইতিহাসের ঘটনা চিত্রণে উৎসাহ পাচ্ছেন। *বাবরনামার* চিত্রণে শিল্পীরা পুরানো বৃদ্ধ কর্মচারীদের কাছ থেকে বিবরণ নিয়ে চিত্রণ করেছেন। *আকবরনামায়* আবুল ফজলের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ থাকায়, কল্পনার স্থান ছিল কম। শিল্পীদের কাজে এতেও সমস্যা ছিল। আকবরের নিখুঁত প্রতিকৃতি করা হলেও, তাঁকে অতিমানব হিসাবে দেখানো প্রয়োজন। ফলে আকবরকে দেখানো হয় অন্যদের তুলনায় বড় করে।

গোঁড়া ইসলামীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে আকবর যে ধর্মীয় নীতি চালু করেছিলেন তার প্রকাশ সমকালীন চিত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। একদিকে দেখা যাচ্ছে যে আকবর আল্লার কাছে প্রার্থনা করছেন বাংলায় অভিযানের আগে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি *ইবাদতখানাতে* জেসুইট পাদ্রীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। মুঘল চিত্র-সংকলনের মধ্যে মেরী ও যীশুর ছবি পাওয়া গিয়েছে। আবার তার পাশে রয়েছে মহাভারত ও রামায়ণের চিত্রাবলী।

মুঘল শিল্পীরা আকবরকে দেবতার প্রতিভূ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। আলোকময় বৃত্ত সম্রাটের মুখমণ্ডলের চারপাশ ঘিরে রয়েছে। সম্রাট যে অভিজাতদের ঊর্ধ্বে সেটা পরিষ্কার। কিন্তু মুঘল শিল্পীদের নিজস্ব শৈলী যা পারসীক ও প্রাক-মুঘল রীতির মিশ্রণে গড়ে উঠছিল, সেটা প্রকাশ করাই তাদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে মুঘল শিল্পীকে অনেক নির্ভর করতে হত পৃষ্ঠপোষকতার উপর।

আকা রিজা নামে এক চিত্রকরের অধীনে যুবরাজ সলীম আগ্রাতে একটা চিত্রশালা খুলেছিলেন। সলীমের বিদ্রোহের সময়ে এটিকে এলাহাবাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১৬০২

Scanned with CamScanner

সালের দুটি পুঁথিচিত্রণ পাওয়া গিয়েছে যেগুলি এলাহাবাদে তৈরি করা হয়েছিল। আরো কয়েকটি পুঁথিচিত্রণ ঐ সময়েই শুরু করা হয়েছিল যেগুলি সলীম সিংহাসনে আরোহণ করার পর শেষ করা হয়। এগুলি ছাড়া *মুরারকা* বা সংকলন করা হয়েছিল যার মধ্যে ছিল পারসীক ওস্তাদের ছবি, ইউরোপীয় এবং আদি-আকবরী চিত্রকলা। এগুলি দেখলে মনে হয় যে জাহাঙ্গীরের সময়ে একটা ছোটখাট শিল্পকলার বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল।

ধারাটি শুরু হয়েছিল যখন উনি যুবরাজ ছিলেন। কিন্তু তখনই উনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতেন। একটা ছোট চিত্রকরদের গোষ্ঠী নিয়ে কাজ করাতেন বিশেষ বিষয়ের উপরে যেগুলি তিনি নির্বাচন করেছিলেন বা কোন ব্যক্তির বা কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষের উপরে। প্রথমদিকে উনি পুঁথিচিত্রণ করলেও, পরে উনি প্রতিকৃতিতে আকৃষ্ট হন এবং বিভিন্ন বিষয়ের লোকেদের প্রতিকৃতি করিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর চিত্রকর বিষণদাসকে ইরানে পাঠিয়েছিলেন, শাহ ও তাঁর পরিবারের প্রতিকৃতি আঁকার জন্য। প্রতিকৃতি আঁকা আকবরের সময়েই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং আকবর ছাড়াও রাজপরিবারের সদস্য ও বড় বড় ওমরাহদের দণ্ডায়মান প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছিল। এগুলির অনেকগুলিই জাহাঙ্গীরের *মুরারকার* মধ্যে রয়েছে এবং এগুলির মধ্যে চিত্রকর মনোহর, নানহা ও ফারুক বেগের নাম পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের সময়কালের অধিকাংশ প্রতিকৃতি আঁকেন মনোহর, বিষণদাস ও ফারুক বেগ। পরবর্তীকালে এই ধরনের সংকলনের ছবিগুলির নকল করা হত। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সময়ের অভিজাতরা ঐসব নকলের সংকলন সংগ্রহ করতেন।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই দরবারী প্রতিকৃতি ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। এর মাধ্যমে সম্রাট নিজেকে রাষ্ট্রের প্রতিভূ হিসাবে দেখান যেখানে অভিজাতদের একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। দু'ধরনের প্রতিকৃতি গড়ে উঠেছিল—একদিকে বিশাল তৈলচিত্র ও অন্যদিকে এনগ্রেভিং ও *ওয়াশ* পদ্ধতি করা অণুচিত্র। ১৫৮০ সালের পর থেকে মুঘল দরবারে ঐ ধরনের ইউরোপীয় প্রতিকৃতি আসতে থাকে। মুঘল শিল্পীরা অণুচিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষতা অর্জন করেন। জাহাঙ্গীর আকবরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সঙ্গে মিলে যায় সাদা-কালো রঙের একটা আকবরের স্কেচ। ১৬০৫ সালের আর একটি স্কেচ মুঘল শিল্পীদের প্রতিকৃতি আঁকবার দক্ষতা প্রমাণ করে। বলা যায় যে জাহাঙ্গীরের সময়ে তাঁরা এই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

এই ধরনের প্রতিকৃতি করার পিছনে ইউরোপের মতই বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রয়োজন কাজ করত। জাহাঙ্গীর তার নিজের জীবনীতে এর কিছুটা ব্যক্ত করেছেন। ইরানের শাহ ও তাঁর অভিজাতদের চেহারা জানার জন্য শিল্পী বিষণদাসকে পাঠানো হয়েছিল। ঐ একই সময়ে উনি উজবেগদের ছবি আঁকিয়েছিলেন। আঁকা হলে এদের ছবি যথার্থ হয়েছে কিনা সেটা জাহাঙ্গীর যাচাই করে নিতেন।

আকবরের মত জাহাঙ্গীরও তাঁর জীবনের বিশেষ ঘটনাবলীর চিত্রণ করিয়েছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে জাহাঙ্গীরের রাজ্যলাভ, নানারকম উৎসবের দিনে জমায়েত, তাঁর জন্মদিনে

Scanned with CamScanner

ওজন নেওয়া, তাঁর শিকার ইত্যাদি। তাঁর জীবনের শেষদিকে জাহাঙ্গীর আফিম ও মদে আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং নূরজাহানের হাতেই ছিল সাম্রাজ্যের ক্ষমতার রাশ। ঐ সময়ে বিচিত্র বা আবুল হাসান জাহাঙ্গীরের যা প্রতিকৃতি করেছেন যাতে সম্রাটকে নানা প্রতীকের মাধ্যমে বড় করে দেখানো হয়েছে। আর একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি পারসীক সম্রাট শাহ আব্বাসকে আলিঙ্গন করছেন, যদিও তাঁর সঙ্গে শাহ আব্বাসের কোনদিন দেখা হয়নি। এমনকি এটাও দেখা যায় যে তিনি তাঁর অদম্য শত্রু মালিক অম্বরকে তীরবিদ্ধ করছেন, যদিও মালিক অম্বরকে বশ্যতা স্বীকার করানো যায়নি। এসবের থেকে ক্রমশ শিল্পীরা ধারণা দিতে থাকে, বলাবাহুল্য সম্রাটের অনুমোদনক্রমে, যে সম্রাটকে ভগবান সাহায্য করছেন এবং তিনি সব পার্থিব রাজার উপরে। মুঘল চিত্রকলায় এই নূতন বৈশিষ্ট্য এসে যাবার ফলে ও প্রতিকৃতি করার দক্ষতা থাকার ফলে পুঁথিচিত্রণ করা ক্রমশ বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। *মুরারকা* বা সংকলন, যার মধ্যে প্রতিকৃতি ছাড়াও, নৈসর্গিক চিত্র ও ইউরোপীয় এনগ্রেভিং রয়েছে, সেগুলি বেশি সমাদৃত হতে থাকে।

জাহাঙ্গীরের চিত্রকরদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন ওস্তাদ মনসুর এবং আবুল হাসান। সম্রাট এঁদের বিশেষ উপাধি দিয়েছিলেন। ওস্তাদ মনসুর বিরল প্রজাতির পশুপাখীর অসাধারণ ছবি এঁকেছিলেন। আবুল হাসান ছিলেন আকা রিজার ছেলে। তাঁর প্রথমদিকের আঁকা ছবির মধ্যে ছিল ১৬০০ সালে ইউরোপীয় চিত্রকর ভুরারের সেন্ট জন ছবির নকল। তখন আবুল হাসানের বয়স তেরো। পরবর্তীকালের ছবিতে জাহাঙ্গীরের অতিমানব চেহারা তুলে ধরেন।

১৫৬৭ সালে সুরাট অভিযানের সময় আকবরের সঙ্গে একদল পর্তুগিজদের কথাবার্তা হয়। ১৫৮০ সালে তাঁর নিমন্ত্রণে গোয়া থেকে আসেন জেসুইট ধর্মযাজকরা ফতেপুরসিক্রীতে। নানান জিনিসের সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য তাঁরা ইউরোপীয় ছবি ও এনগ্রেভিং আনেন। সেন্ট লুকের আঁকা *ম্যাডোনা* ছবির কপি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং সম্রাট এর নকল করার আদেশ দেন। এটি ছাড়া মাতা মেরীর একটি ছবিও প্রশংসা পেয়েছিল।

১৫৮০ সালের পর কেশবদাসের ছবিতে ইউরোপীয় প্রভাব দেখা যায়। অন্যান্যদের ছবিতেও এই প্রভাব পড়তে থাকে। এর ফলে মুঘল চিত্রকলায় মানুষের শরীর ও দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রাকৃতিক জগতকে দেখতে পাওয়া যায়। আবুল ফজলও বলেছেন যে শুধু পারসীক রীতি নয়, ইউরোপীয় ধারা ঐসব শিল্পীর কাজের মধ্যে পাওয়া যায়। কয়েজন অভিজাতও ইউরোপীয় ছবির নকলে ছবি আঁকাতে থাকেন।

যুবরাজ সলীম জেসুইটদের সঙ্গে কথাবার্তা চালান এবং পাদ্রী জেভিয়ার দেশ থেকে আকবর ও সলীমের জন্য মেরী ও যীশুর ছবি চেয়ে পাঠান। সলীম ইউরোপীয় চিত্রগুলির একটা সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। সম্রাট হবার পরও জাহাঙ্গীর জেসুইটদের সঙ্গে খ্রিস্টধর্ম নিয়ে আলোচনা চালাতেন, যার ফলে জেসুইটরা মনে করেছিলেন যে জাহাঙ্গীর খ্রিস্টধর্মে আকৃষ্ট হয়েছেন।

Scanned with CamScanner

প্রথমদিকে মুঘল শিল্পীরা মুঘল রং ব্যবহার করতেন ইউরোপীয় শৈলীর সঙ্গে। কিন্তু ক্রমশ তাঁরা নিজেদের করা ছবিতে মাঝে মাঝে ইউরোপীয় পটভূমিকা—যেমন ইউরোপীয় শহরের একাংশ বা ইউরোপীয় ব্যক্তি এনে দিতেন প্রধানত বৈচিত্র্যের জন্য। দূরে পিছনে ইউরোপীয় পুরুষ ও মহিলাদের দেখা যেতে লাগল। *রজমনামা* ও *রামায়ণ*-এর কয়েকটি নকল ছাড়াও অন্য কয়েকটি পুঁথিচিত্রণে এইসব দৃশ্য দেখা যায়। জাহাঙ্গীরের সময়ে শিল্পীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে খ্রিস্টধর্মের প্রতীক ও চিহ্ন ব্যবহার করে এক নূতন শৈলীর সঞ্চার করেন। পটভূমিকার রং ও রেখা আরো বেশি সুদৃঢ় হতে লাগল ইউরোপীয় প্রভাবে। আবুল হাসান তাঁর বহু ছবিতে ইউরোপীয় রং ও চিহ্নের ব্যবহার করেছেন। বাসওয়ান আরো বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইউরোপীয় ধারা, প্রতীক ও চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। পটভূমিকার গভীরতা আনা ও রং-এর সার্থক ব্যবহার করে মুঘল শিল্পীরা ইউরোপীয় শৈলীর সঙ্গে মুঘল শৈলীর একটা মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।

সব ছবিতে যে এই মিশ্রণ সুসাদৃশ্য ঘটিয়েছিল তা নয়। ইউরোপীয় নিসর্গের দৃশ্য পটভূমি করে পারসীক কাহিনী বিধৃত করা হয়েছে। কোরানের প্রতিলিপির পাশে রয়েছে ফ্লেমিশ শিল্পীদের আঁকা কৃষক পরিবার ও মেরীর ছবি। এর পাশে আছে ডুরারের আঁকা *সেন্ট জন দ্য ব্যপ্টিস্ট*। আর একটি ছবিতে রয়েছে মাতা মেরীর শিশুপুত্র। এর পাশে চলছে মদ্যপান ও আমোদপ্রমোদ। এর থেকে দুটি দিক দেখা যেতে পারে। এক, মুঘল শিল্পীরা ইউরোপীয় আঙ্গিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, ইউরোপীয় বিষয়ের প্রতি নয়। দুই, মুঘল শিল্পীরা ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে মুঘলদের যে অবজ্ঞার ভাব ছিল, সেটাও সচেতন বা অচেতনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই মুঘল চিত্রকলার অবক্ষয়ের যুগ শুরু হয়ে যায়। যুবরাজ থাকার সময়ে শাহজাদা খুরম পুঁথিচিত্রণ সংগ্রহে উৎসাহী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁর এই উৎসাহ ছিল, যা পরবর্তীকালে স্থাপত্যের দিকে চলে যায়। গোঁড়া আওরঙ্গজেব চিত্রকলা ও সঙ্গীত অপছন্দ করতেন, যার ফলে এগুলি অবক্ষয়ের দিকে চলে যায়। চিত্রশালা ওঁর সময়ে বন্ধ হয়ে গেলে, চিত্রকররা অন্য জায়গায় চলে যেতে থাকে।

প্রথম কয়েক বছর শাহজাহান চিত্রকরদের আগের মতই কাজ করতে দিয়েছিলেন। জাহাঙ্গীরের থেকে শাহজাহানের ধারণা অন্যরকম হওয়ার ফলে চিত্রশৈলীর বদল হতে থাকে। শাহজাহান অবশ্য নিজেকে পৃথিবীর অধীশ্বর বলে প্রতিকৃতিতে দেখাতে পছন্দ করতেন যেখানে পরীরা স্বর্গ থেকে মুকুট নিয়ে আসছে। জমকালো পোশাক পরে বড় সভায় বসে আছেন, এটাও দেখতে ভালোবাসতেন। এর মধ্যে তাঁর স্থান ছিল সব থেকে উঁচুতে। আর একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি জাহাঙ্গীর ও আকবরের সঙ্গে আছেন এবং আকবর ওঁকে মুকুট দিচ্ছেন।

শাহজাহানের প্রথমদিকের কয়েকটি পুঁথিচিত্রণের শৈলীতে জাহাঙ্গীরের আমলের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একটা নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে পটভূমির গভীরতা আনার

Scanned with CamScanner

জন্য হয় পিছনে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করা হয়েছে নয় রঙীন শহরাঞ্চল দিয়ে পটভূমি তৈরি করা হয়েছে। একক প্রতিকৃতির মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তবে আকবরী ও জাহাঙ্গীরী শৈলী একেবারে বদলে যায়নি। চারপাশে পশুগুলিকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে অন্তত একটা ছবিতে দেখানো হয়েছে। বিভিন্ন পুঁথিচিত্রণে এই ধরনের অপসৃত পটভূমি দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি যে সব ছবিগুলিতে সম্রাট ধর্মীয় লোকেদের বা কবিদের সঙ্গে আলোচনায় রত, সেগুলিতেও পটভূমিকা হিসাবে শহরাঞ্চলের ছায়ারেখা দেখা যাচ্ছে। জাহাঙ্গীরের তুলনায় শাহজাহানের সময়ে প্রতিকৃতি আঁকা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। দরবারের অভিজাতদের, এমনকি সঙ্গীত শিল্পীদেরও, প্রতিকৃতি আঁকা রেওয়াজ হয়ে যায়। অঙ্কনের দক্ষতা ও হাল্কা তুলির স্পর্শ এইসব ছবিগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

শাহজাহানের উৎসাহ স্থাপত্যের দিকে গেলেও তাঁর চিত্রশালাতে *শাহজাহাননামা* ১৬৫৭ সালে চিত্রিত করা হয়। এটাই বোধহয় মুঘল পরম্পরার শেষ কাজ। যুবরাজ দারা শুকো যখন মরমীয়া সাধুদের সঙ্গে নানান ধরনের আলোচনা করছেন, তখন এই পুঁথিচিত্রণে দেখা যাচ্ছে যে শাহজাহান সূফিসন্তদের নাচ দেখছেন। আর একটি ছবিতে দরবেশদের নাচ দেখা যাচ্ছে। যার সঙ্গে রয়েছে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মীয় সন্তদের প্রতিকৃতি। শাহজাহানের *মুরারকাতে* ফুলের যেসব নিদর্শন পাওয়া যায় তার নিদর্শন তাজমহল ও লালকেল্লায় রয়েছে।

জাহাঙ্গীরের সময়ের শক্তি ও সজীবতার বদলে শাহজাহানের সময়ে পাওয়া যায় জমকালো ছবি যেগুলি প্রায় প্রাণহীনভাবে আনুষ্ঠানিক কাজ করছে পরম্পরা অনুযায়ী। এই অবক্ষয়ের পথে তাঁর গোড়ামীর মাধ্যমে আওরঙ্গজেব আরো এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেন। জীবনের শেষদিকে উনি কতকগুলি মোটামুটি ভালো অণুচিত্রণ করিয়েছিলেন যেখানে উনি শিকার বা যুদ্ধে যাচ্ছেন দেখানো হয়েছে। কিন্তু এগুলি চিত্রশালাকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না এবং চিত্রকররা ক্রমশ অন্যান্য প্রদেশে চলে যেতে শুরু করলে চিত্রশালার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিকৃতি করা হয়েছিল যার নিদর্শন পাওয়া যায়।

প্রাদেশিক চিত্রকলা

মুঘল দরবারী চিত্রকলার প্রভাব কিছু পরিমাণে অন্যান্য প্রদেশের চিত্রকলার মধ্যে পাওয়া যায়, যদিও এদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল। মুঘল আঙ্গিকের তুলনায় বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহমদনগরে যে ক্ষণস্থায়ী চিত্রশৈলী গড়ে উঠেছিল, সেগুলির রঙের ব্যবহার ও অলঙ্কারে মুঘল শৈলীর থেকে আলাদা ছিল। এগুলির মধ্যে যে কাব্যিক ধরন রয়েছে, তা মুঘল চিত্রকলায় পাওয়া যায় না। এই ধরনের প্রথমদিকের দাক্ষিণাত্যের একটি পুঁথি-চিত্রণ পাওয়া যায় অর্ধসমাপ্ত *তারিক-ই হোসেন শাহীতে*, যেখানে বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণের মধ্যে রাজকীয় পোশাক পরে দেখা যাচ্ছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বিজাপুরে অনেক-গুলি রাগ ও রাগিনীর অসাধারণ ছবি পাওয়া যায়, যার মধ্যে হিন্দোলা রাগের ছবিটি

Scanned with CamScanner

অসাধারণ বলে মনে করা হচ্ছে। ১৫৭০ সালে যে *এনসাইক্লোপিডিয়া* করা হয়েছিল যার মধ্যে নানান আকার ও ধরনের পুঁথিচিত্রণ রয়েছে, সেটি বিজাপুরে করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বিকানীরের রাজা অনুপ সিং কতকগুলি রাগ-রাগিনীর ছবি আনেন, যেগুলির মধ্যে মুঘল প্রভাব চোখে পড়ে। বিজাপুরের রাজা প্রথম আলি আদিল শাহ ও দ্বিতীয় ইব্রাহিম আলি আদিল শাহ বহু প্রতিকৃতি আঁকান। এগুলির মধ্যে অনেক বেশি সজীবতা ও রোমান্টিসিজম দেখা যায় যা মুঘল চিত্রকলায় পাওয়া যায় না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গোলকুণ্ডাতেও প্রতিকৃতি করা হতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই এই কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

আকবরের সময় থেকেই মুঘল চিত্রশিল্পীরা দেশের নানাপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজস্থানের বিভিন্ন রাজাদের চিত্রশালায় যেমন অম্বর, বুঁদি, কোটা, মেবার ইত্যাদিতে এরা সাদর অভ্যর্থনা পায়। আকবরের রাজপুত নীতি ছিল প্রধানত কয়েকটি রাজপুত রাজার বংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাহাঙ্গীর এই নীতির মধ্যে অনেক বেশি সংখ্যায় রাজপুত রাজাদের নিয়ে আসেন। এর ফলে রাজপুত রাজাদের দিল্লি ও আগ্রাতে বেশ কিছুদিন থাকতে হত। দরবারী মর্যাদা পাবার ফলে দরবারী চিত্রগুলিতে এঁরাও স্থান পেতে থাকেন ও মুঘল চিত্রকলার সঙ্গে যোগাযোগ হয়।

রাজস্থানী চিত্রকলায় যে মিশ্র আঙ্গিক গড়ে ওঠে, মুঘল চিত্রকলার প্রভাবে সেটি জোরদার হয়েছিল। রাজস্থানী চিত্র আঙ্গিকের মূলে বিভিন্ন রীতি দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম ভারতীয় পুঁথিচিত্রণ রীতি, যেগুলি প্রধানত জৈন রাজস্থানের লোকশিল্পের ঐতিহ্য যার মধ্যে ছিল উজ্জ্বল রঙের সমাবেশ ও স্পষ্ট রেখা। এর সঙ্গে যুক্ত হল মুঘল আঙ্গিক, যেটি একদিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা চিত্রভূমিতে নিয়ে আসে এবং অন্যদিকে কাহিনীর বর্ণনামত একটা কল্পলোক তৈরি করে।

সপ্তদশ শতক থেকে রাজস্থানী চিত্রকলায় দেখা যায় বিশেষ কাহিনী যার মধ্যে রয়েছে নায়ক-নায়িকা ভেদ, বারমাস্যা, রাগমালা ইত্যাদি। এর সঙ্গে যোগ হয় লৌকিক গাথা যার মধ্যে রয়েছে ঢোলা মারু, লোর চন্দ্রাণী ইত্যাদি। তবুও এই চিত্রগুলিতে রাজস্থানের আঞ্চলিকতা লক্ষ করা যায়। কতকগুলি পুঁথিচিত্রণের সময়কাল ও আঙ্গিক নিয়ে বিতর্ক আছে যার মধ্যে *চৌরপঞ্চাশিকার* উল্লেখ করা যায়।

১৬০৫ সালে মেবারের *রাগমালী* পুঁথিপত্র মুসলমান শিল্পীর করা কিনা বিতর্ক আছে। এখানে মিশ্র আঙ্গিক দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া একাধিক *ভাগবতপুরাণ*, দুটি *রামায়ণ* ও একটি *গীতগোবিন্দ* চিত্রিত করা হয়েছিল। এগুলিতে মুঘল প্রভাব পোশাক ও ভঙ্গীতে সীমাবদ্ধ। স্থাপত্যগুলি কাহিনীর পটভূমিকা রচনা করে। নায়ক-নায়িকাদের চেহারা মূলত একই ধরনের, কিন্তু উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার রয়েছে। রঙের বৈপরীত্যও নিয়ে আসা হয়।

বুঁদি ও কোটার ছবিগুলি বিষয়বস্তু রাজস্থানী প্রথমদিকের ছবিতে মেবার চিত্রকলার প্রভাব স্পষ্ট। পরের দিকের ছবিতে মুঘল প্রভাব পাওয়া যায়। ১৬৬২ সালে এক আমীর

Scanned with CamScanner

ও তার প্রেমিকা ছবিতে মুঘল দরবারী চিত্রের প্রভাব রঙ, পোশাক ও চিত্রভূমির বিভাজনের মধ্যে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে শিকার দৃশ্যের ছবিগুলির সঙ্গে শাহজাহানের শিকার দৃশ্যের সাদৃশ্য দেখা যায়।

অম্বরের (জয়পুর) নিজের সংস্কৃতি ব্যাহত হয়নি। এখানকার চিত্রে নায়িকারা মরিয়ম জামানির পরিচারিকাদের মত পোশাক পরে আছেন। পরবর্তীকালে রাজপুত অভিযানে মহিলারা যোধাবাঈ-এর মত পোশাক পরতেন। মুঘল আঙ্গিক—নীল আকাশ, আলোছায়ার খেলা ইত্যাদি—এখানে পরিষ্কার যদিও কাহিনী বিধৃত হচ্ছে ঘটনার মধ্য দিয়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে এই দ্বন্দ্ব অনেকটা মিটে যায়। রাজপ্রাসাদের প্রেক্ষাপটে এক বিলাসবহুল জীবনযাত্রার কথা বলা হয়, যেখানে গ্রাম্য জীবন অনুপস্থিত নয়, কিন্তু দরবারী শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখা। লোকশিল্পের আঙ্গিক ক্রমশ দূরে চলে যেতে থাকে।

মুঘল দরবারী চিত্র থেকে অনেকটা ভিন্ন ধর্মী ছিল অম্বর ও আজমীরের মধ্যেকার রাজ্য কিশানগড়ে। এটি ছিল যোধপুরের রাণার অধীনে। এখানকার চিত্রগুলিতে নায়ক-নায়িকার ভিন্ন চেহারা ও কাব্যধর্মী পরিবেশ বিভিন্ন অলঙ্কারের সাহায্যে করা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় এর চিত্রমালায় মৌলিক আঙ্গিকের প্রকাশ ঘটে। ছবিগুলি অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। একদিকে দৃশ্যপটে গাছ, প্রান্তর বনভূমি দৃশ্যজাতের উপস্থিতি। অন্যদিকে কাহিনীর কল্পলোকে অবস্থান। এর সঙ্গে মুঘল নিয়ম অনুযায়ী কিছু মোটিফ অলঙ্কার হিসাবে রয়েছে। নগর, বন ইত্যাদিতে দূরত্বের আভাষ পাওয়া যায় এবং কাহিনী ঘটনা অনুযায়ী এগোতে থাকে। কিশানগড় চিত্রকলার এই ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত থাকে যখন অন্যান্য রাজস্থানী চিত্রধারাকে প্রাণহীন পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত করেছিল। এর পূর্ণতা আসে পরবর্তীকালের পাহাড়ী চিত্রকলায় যেগুলি ছিল মূলত যোধপুরের যার প্রেরণা ছিল ভক্তিবাদ।

ষোড়শ শতক থেকেই বৈষ্ণবধর্ম রাজস্থানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। শ্রীকৃষ্ণের লীলা থেকে যে রূপকল্পের জন্ম দেয় তার প্রকাশ পায় ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* ও বাৎসায়নের *কামসূত্র* থেকে। এরই প্রকাশ ঘটে বিভিন্ন রসসৃষ্টির মাধ্যমে যার সঙ্গে যোগ হয় প্রকৃতি ও দৃশ্যজগৎ। এই রসবোধ যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করে, তা এক কল্পলোক তৈরি করে যেখানে মুঘল চিত্রের দৃশ্যজগৎ পটভূমি রচনা করে। কাহিনী বিধৃত হতে থাকে ভক্তি, প্রেম ও লীলার বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

Scanned with CamScanner